পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০০৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০০৮

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ৪-৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির প্রতিবেদন পৃষ্ঠা ০৭-৩৮

(ক) সাধারণ পৃষ্ঠা ০৮-০৯

পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান
সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

(খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ পৃষ্ঠা ১০-২০

অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ
সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান
স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন
কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ
উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম
পার্বত্য জেলা পুলিশ
ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার
পরিষদের বিশেষ অধিকার
পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পৃষ্ঠা ২১-২৩

পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন
উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার
ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান
১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ
অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী পৃষ্ঠা ২৪-৩৮

উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন
আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন
ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত

ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি
রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ
কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান
উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা
জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান
সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার
জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন
সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার
সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি
পৃষ্ঠা ৩৯-৪৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০০৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০০৮
জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

Parbatya Chattagramer Chukti Bastabayan Prasange ॥ 2 December 2008
published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2008 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Telefax: +880-351-61248
E-mail: pcjss.org@gmail.com, pcjss@hotmail.com, Website: www.pcjss-cht.org

Price : Tk. 20.00 only

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করুন

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি

বর্তমানে দেশে সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ চলছে। দেশের জাতীয় রাজনীতির এক সংঘাতময় অবস্থায় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারী হয়। অতঃপর দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। পরিবর্তনের আশায় দেশের নাগরিক সমাজ প্রথম অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসে।. ক্ষমতায় আসার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বলিষ্ঠ উদ্যোগও গ্রহণ করে। বিশেষ করে নির্বাহী থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপ এর মধ্যে অন্যতম বলা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কিছু ভুল পদক্ষেপ, দুর্নীতির নামে অনেককে গ্রেফতার ও হয়রানি, পক্ষান্তরে দুর্নীতিবাজদের দিয়ে সংস্কারের নামে দলভাঙার রাজনীতি, জামায়াতের অনেক নেতার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতার না করা, যুদ্ধাপরাধী জামায়াত চক্রের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে পাটকল বন্ধ ঘোষণা, বস্তি ও হকার উচ্ছেদ, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকারের সততা ও নিরপেক্ষতা এবং নির্বাচনী রোডম্যাপ নিয়ে সংশয় ইত্যাদির ফলে সরকারের প্রতি জনমনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অপরদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। পক্ষান্তরে দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরতে সরকার বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শে জাতীয় সম্পদ তেল গ্যাস-বন্দর সাম্রাজ্যবাদী কর্পোরেট কোম্পানীর কাছে বিকিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এমনিতর অবস্থায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ প্রধান উপদেষ্টার জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ১৮ ডিসেম্বর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এরফলে নির্বাচন নিয়ে কিছুটা সংশয় কেটে গেলেও জাতীয় নির্বাচনের সময় যতই ঘনীভূত হতে থাকে ততই উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন, জাতীয় সংসদ আসনসমূহের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং এর ফলে নির্বাচনকে ঘিরে উদ্ভূত হয় অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর উত্তেজনা। বস্তুতঃ নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে দেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের কোন বিকল্প রাজনৈতিক পথ খোলা নেই বলে জনসংহতি সমিতি দৃঢ়ভাবে মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি

বস্তুতঃ ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সারা দেশের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতিরও কোন মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পক্ষান্তরে এ সরকারের আমলে জরুরী অবস্থার সুযোগে জুম্ম জনগণের উপর ধর-পাকড়, জেল-জুলুম ও হয়রানি বৃদ্ধি পায়। এ সময় জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের অর্ধ-শতাধিক নেতা-কর্মীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও জুম্মদের ভূমি অধিকারের পক্ষে সোচ্চার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় অভিযুক্ত করা হয় এবং অনেককে মিথ্যাভাবে সাজা দেয়া হয়। পাশাপাশি জুম্ম জনগণকে তাদের জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করে বহিরাগত অভিবাসীদের বসতি স্থাপনের কার্যক্রম অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় জোরদার হয়ে উঠে। জুম্মদের জায়াগ-জমি জবরদখল পূর্বক বহিরাগত বাঙালী পরিবার বসতি প্রদানের উদ্দেশ্যে গত ২০ এপ্রিল রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন

সাজেক এলাকায় ৭টি জুম্ম গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় সেনাশাসন, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী তৎপরতা, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, সর্বোপরি জুম্মদের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা মদদদানের কার্যক্রম জোরদার হয়ে উঠে। জরুরী অবস্থার মধ্যেও তথাকথিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় সদা তৎপর ছিল। নিজেদের হীন কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একটি প্রভাবশালী কায়েমী গোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়ার পূর্ব-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে থাকে। এলক্ষ্যে ইউপিডিএফ নামধারী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনকে পূর্বের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অধিকতর মদদ দেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত দুই বছর মেয়াদকালে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। জাতীয় পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশংসনীয় সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও আগেকার নির্বাচিত সরকারগুলোর মতো বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলে। পার্বত্যবাসী আশা করেছিল যে, অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো বাস্তবায়নে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেভাবে একের পর এক সাহসী বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছিল সেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে আসবে। গত ২৭-২৮ মার্চ ২০০৮ প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর এবং এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক বক্তব্য দেয়ার ফলে পার্বত্যবাসী আশান্বিত হয়ে উঠে। কিন্তু কার্যতঃ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পূর্বের রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে নেতিবাচক নীতি অনুসরণ করতে থাকে।

এরই অংশ হিসেবে গত বছর অক্টোবরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি'কে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আগের রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পদদলিত করে ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অস্থায়ী ও বহিরাগত বাঙালীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়; যার পেছনে একটি প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী জড়িত রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার অন্যতম বিশেষ সহকারী হিসেবে জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগদান করা হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জনগণের উন্নয়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন ইতিবাচক মনোভাব প্রতীয়মান হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, অস্থিতিশীল ও নিরাপদহীন হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ার কারণে উন্নয়ন কার্যক্রমেও যেমনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা গড়ে উঠেনি তেমনি গণমুখী ও পরিবেশমুখী উন্নয়ন ধারা সৃষ্টি হতে পারেনি। নিম্নে একনজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা তুলে ধরা হলো-

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ বিধান করা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে জুম্মদের ভূমি জবরদখল করে সেটেলার বাঙালী বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছে।

২. আইন মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কার্যকর করা হয়নি। সরকার আঞ্চলিক পরিষদ কার্যবিধিমালাসহ অন্য কোন বিধিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

৩. তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট যথাযথ দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। চুক্তির পর পরিষদে ন্যস্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হস্তান্তর ও কার্যকর করেনি ও পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি। সরকার তার পছন্দ-সই লোকদের পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করছে। এসব অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই।

৪. পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে ৩১টি সেনা ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হলেও এরপর সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যদিও সরকার এযাবৎ ১৭২টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করেছে বলে দাবী করছে, কিন্তু এর সপক্ষে কোন দলিলপত্র বা প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের তালিকা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে 'অপারেশন দাবানল'-এর নাম পরিবর্তন করে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বিগত শেখ হাসিনা সরকার ও খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে পর পর তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন ভূমি নিষ্পত্তির কাজ শুরু করেনি। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" প্রণীত হয়। কিন্তু উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা আজও সংশোধিত হয়নি।

৬. সরকার প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ভূমি ফেরৎ দেয়নি। শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম সেটেলার বাঙালীদের জবরদখল হতে মুক্ত করেনি ও ৯,৩২৬ শরণার্থী পরিবারকে তাদের জমিজমা ফেরৎ দেয়নি।

৭. সরকার আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদেরকে পুনর্বাসন করেনি। পক্ষান্তরে চুক্তি লঙ্ঘন করে ৩৮,১২২টি বহিরাগত সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে তালিকাভুক্ত করে সমস্যাকে আরো জটিল করা হয়েছে।

৮. রাবার চাষ ও অন্যান্য খাতে প্রদত্ত জমির লীজ এখনো বাতিল করা হয়নি। উপরন্তু এই ধারা লঙ্ঘন করে লীজ দেয়া অব্যাহত রয়েছে।

৯. স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। পক্ষান্তরে বহিরাগত সেটেলার ও চাকুরীজীবীসহ অস্থায়ী বাসিন্দাদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১০. পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর হয়নি।

১১. সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান লঙ্ঘন করে সার্কেল চীফের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান চালু করা হয়েছে।

১২. সরকার জনসংহতি সমিতির সদস্য ও প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি।

১৩. বিগত জোট সরকার ও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়নি।

১৪. জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা হয়নি।

১৫. জনসংহতি সমিতির সদস্য ও স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখনো সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়নি। আরো ১১৪টি মামলা এবং সামরিক আদালতে দায়েরকৃত মামলা অপ্রত্যাহৃত রয়ে গেছে।

বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তেমনি রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা ও আইনের শাসন কায়েম করাও অসম্ভব বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। তাই আসুন, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করি এবং দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

চুক্তির প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পর ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ চুক্তিটি মন্ত্রিপরিষদে পাশ হয় এবং গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ১৯৯৮ সালের মে মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন প্রণীত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলার সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ও বিভাগ এই চুক্তি বাস্তবায়নে নানা অজুহাতে গড়িমসি করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির ধারাসমূহ সম্পর্কে অপব্যাখ্যা পূর্বক তা লঙ্ঘন করে কর্ম সম্পাদনের সর্বাত্মক প্রবণতা ও প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। অনুরূপভাবে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ উক্ত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের' কথাগুলি দ্বারা সরকারী পরিকল্পনাধীনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিদানকারী বাঙালী সেটেলার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশকৃত বা অনুপ্রবেশরত অস্থায়ী বাঙালী সেটেলারদেরকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অপব্যাখ্যা দিয়ে আগেকার মতো তাদের অনুকূলেই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে।

বস্তুতঃ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের' কথা দ্বারা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নাগরিক বা বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারা যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি, স্থায়ী অ-উপজাতীয় বাসিন্দা নির্ধারণ, স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান সদস্য পদে প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়াবলীর সাপেক্ষেই তা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল থেকে অপব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে যে, উক্ত সকল নাগরিক বলতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বা অবস্থানরত স্থানীয় ও অ-স্থানীয় সকল ব্যক্তির কথাই বুঝানো হয়েছে!

সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বার বার দাবী উত্থাপন করা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ হতে এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

(ক) সাধারণ

পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান

চুক্তির ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বিধান অনুযায়ী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'কে ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে সেটেলার বাঙালীদের পুনর্বাসন; সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা; বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ; জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; ভূমি বেদখল; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান; জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো; তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' গঠনের মাধ্যমে সেটেলার বাঙালীদের সংগঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

এলক্ষ্যে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রামের ২৮ হাজার পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সাজেক এলাকায় ১০ হাজার বহিরাগত বাঙালী পরিবার বসতি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করে। তারই অংশ হিসেবে ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গত ২০ এপ্রিল ২০০৮ জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সেটেলার বাঙালী পরিবারগুলোকে বসতিপ্রদানের লক্ষ্যে সাজেকের বাঘাইহাট-গঙ্গারাম এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয় যেখানে সাতটি জুম্ম গ্রামের শতাধিক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ২০০৭ সালের মার্চ মাসে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার দাঁতকুপ্যা মৌজায় দুই শতাধিক পরিবার বসতি প্রদান করা হয় ও তাদেরকে সহায়তার জন্য দাঁতকুপ্যা গ্রামে এসময় একটি নতুন ক্যাম্পও স্থাপন করা হয়। দেশে জরুরী অবস্থার মধ্যেও মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি, করল্যাছড়ি, লেমুছড়ি ও ক্যাংঘাট এলাকায় কয়েক শত সেটেলার বাঙালী পরিবার বসতি প্রদান করা হয়েছে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দীঘিনালার বাবুছড়ায় ৮১২ পরিবারসহ সাজেক ইউনিয়নে শত শত সেটেলার বাঙালী বসতি প্রদানের ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহতভাবে চলছে।

অপরদিকে মায়ানমার থেকে আগত শত শত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থী প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করছে। তারা ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র নিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে। সরকার পূর্বের মতো এবারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করে ২০০৭-০৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেছে।

সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান

এই খণ্ডের ২নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের বিধান করা হলেও এক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২, ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১, এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১ ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, বন আইন, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন ইত্যাদি আইনসমূহও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। ফলে চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

এই খণ্ডের ৩নং ধারায় চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যকে আহ্বায়ক এবং এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে সদস্য করে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উক্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উক্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। উক্ত কমিটি গঠিত না হওয়ার ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

জোট সরকারের আমলে চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করতঃ উক্ত কমিটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের নামে একদিকে কালক্ষেপণ করা হয় অন্যদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অচলাবস্থায় রাখা হয়।

বিগত জোট সরকারের এ কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের মধ্যে ১০ (দশ) বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকগুলোতে চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিরসনকল্পে চুক্তি মোতাবেক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন- ২০০১' এর সংশোধনপূর্বক ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা এবং এ লক্ষ্যে ভূমি কমিশনের জনবল নিয়োগ ও অফিস স্থাপন; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধিমালা চূড়ান্তকরণ; তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ হস্তান্তরকরণ, হর্টিকালচার সেন্টার, প্রধান তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরকরণ; তিন পার্বত্য জেলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান পদে শ্রী সমীরণ দেওয়ানকে নিয়োগ এবং গত ৩০ এপ্রিল ২০০৬ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট এবং রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় যুব ও ক্রীড়া দপ্তর হস্তান্তর এবং জেলা দায়রা জজ আদালত স্থাপন ছাড়া অন্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য জোট সরকারের কোন সদিচ্ছা ছিল না। ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও একই ধারা অব্যাহত থাকে।

(খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ

চুক্তির এ খণ্ডে বলা হয়েছে যে, উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়ে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেন। এই বিধান মোতাবেক—

১। ১৯৯৮ সালের ৩, ৪ ও ৫ মে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ করা হয়। তবে জেলা পরিষদ আইনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক অনেকগুলো বিষয় ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহ চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সংশোধিত হয়।

২। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮ নম্বর ধারা চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে সংশোধন করা হয়।

৩। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। ক্ষমতাসীন দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিকভাবে বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ এসব অর্ন্তবর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক অধিকতর শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহের সংশোধনের পর পরিষদসমূহের কার্যবিধিমালা এখনো সংশোধিত হয়নি।

৫। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মোট ৩৩টি বিষয়ের (যাতে ৬৮টি কর্ম বিদ্যমান) মধ্যে মাত্র ১২টি বিভাগ ও কর্মের অংশবিশেষ পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষ করে জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), মাধ্যমিক শিক্ষা, যুব কল্যাণ, পরিবেশ, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান ইত্যাদিসহ অধিকাংশ বিষয় হস্তান্তর করা হয়নি।

৬। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয়নি। পক্ষান্তরে নানাভাবে এসব আইনকে পদদলিত করা হচ্ছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ উল্লেখ করা গেল—

অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ

এই খণ্ডের ৩ নং ধারায় বলা আছে যে, "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।

১৯৯৮ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়ন কালে 'বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি' এর মধ্যে অবস্থিত 'এবং' শব্দটির পরিবর্তে 'বা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রবল প্রতিবাদের মুখে অবশেষে ১৯৯৮ সালের ২৩ নং আইন দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক 'এবং' শব্দটি সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু সরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এই ধারা ও আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে এর বাস্তবায়ন বা কার্যকরকরণ বিরোধিতা করছে। এছাড়া বৈধ জায়গা জমি না থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ বহিরাগতদেরকে অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সনদপত্র প্রদান করে যাচ্ছেন এবং এর বদৌলতে বহিরাগতরা ভূমি বন্দোবস্তীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরী ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে যাচ্ছে। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও স্থায়ী অ-উপজাতীয় বাসিন্দাদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান

এই খণ্ডের ৪নং ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কেবলমাত্র তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে লঙ্ঘন করে তিন সার্কেল চীফের পাশাপাশি তিন পার্বত্য ডেপুটি কমিশনারগণও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ জারীকৃত এক অফিসাদেশের পর থেকে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃকও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। অথচ "চার্টার অফ ডিউটিজ অফ ডেপুটি কমিশনারস্" পরিপত্রে ডেপুটি কমিশনারের নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের বিধান থাকলেও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের কোন বিধান নেই।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য জেলা প্রশাসকগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অ-উপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষতঃ চাকুরী, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ও অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাগণ চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে অ-উপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিগণ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে চাকুরীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করে চলেছে। এককথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অ-উপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ২০০২, ২০০৫ ও ২০০৮ সালে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময় অনেক অ-স্থানীয় অ-উপজাতীয় ব্যক্তি 'স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র' সংগ্রহ করে শিক্ষকতার চাকুরী লাভ করেছে।

স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন

এই খণ্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর বিগত ২০০০ ও ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত ভোটার তালিকায় বাংলাদেশের সাধারণ ভোটার বিধিমালা অনুসারে বহিরাগতদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫নং আইন) করা হয়। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি।

বিগত ২০০০ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দাবীর মুখে উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয়ও ভেটিং প্রদান করে। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এক্ষেত্রে কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পূর্বের মতো ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে।

পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

এই খণ্ডের ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসেবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হয়নি।

এই খণ্ডের ১৪ নং ধারার (ক) উপ-ধারায় বলা আছে যে, এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। (খ) নং উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। (গ) নং উপ-ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি।

এ প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিরঙ্কুশভাবে অস্থানীয় ও অ-উপজাতীয়। স্বাভাবিকভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের আমলাতান্ত্রিক একাধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে চলেছে।

উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম

এই খণ্ডের ১৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।

১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়নকালে এই ধারা যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উক্ত ধারা নিম্নোক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

> "(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এই ধারার উপধারা (১) এর আওতায় নিজস্ব তহবিল হইতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।"

> "(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।"

উল্লেখিত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য বিগত সরকারের নিকট বার বার দাবী করা হয়। অবশেষে ২০০০ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১নং আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রথমোক্ত (২ক) উপধারা চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত (৪) উপধারা সংশোধন করা হয়নি।

অপরদিকে পরিষদের আইনকে লঙ্ঘন করে একের পর এক সরকার তার দলীয় লোকজনকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করছে। এসব মনোনীত পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জনগণের কাছে তাদের কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। জনগণ ও আইনের কাছে দায়বদ্ধতার পরিবর্তে তারা ঢাকার নির্দেশ মতো বা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পরিষদসমূহকে পরিচালিত করছে। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে বাধা সৃষ্টি করছে।

পার্বত্য জেলা পুলিশ

এই খণ্ডের ২৪নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা ও পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পুলিশবাহিনী নিয়োগ বা গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ আইনগতভাবে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এ সকল পরিষদসমূহকে উপেক্ষা করে ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। এর ফলে পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও সমন্বিত তত্ত্বাবধানে বিঘ্ন ঘটছে। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে জুম্মদের উৎখাত করে ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে।

ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার

এই খণ্ডের ২৬নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর না করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণে জেলা প্রশাসকগণ নামজারী, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলার গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং সেনা ক্যাম্প, গ্যারিসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদী ভূমি লীজ দেয়া হয়ে আসছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় ভূমিও রয়েছে। এরফলে হাজার জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসী এখন জুমচাষ করতে না পেরে নিজভূমে পরবাসী হয়ে চরম আর্থিক সংকটে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সমতল জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ) অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেয়া হয়েছে। নিম্নের সারণীতে তা দেখানো গেল—

ক্রঃ	উপজেলার নাম	রাবার প্লান্টেশন		হর্টিকালচার প্লট		মোট	
		প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি (একর)
১.	বান্দরবান সদর	৯১	২,২৭৫	১১৯	২,৮৫৫	২১০	৫,১৩০
২.	লামা	৮৩৫	২০,৮৭৫	১৭৭	৪,৫০০	১০১২	২৫,৩৭৫
৩.	আলিকদম	১৯৪	৪,৮৪৭	৬২	১,৫৫০	২৫৬	৬,৩৯৭
৪.	নাইক্ষ্যংছড়ি	১১২	২,৮০০	১৫	৩৭৫	১২৭	৩,১৭৫
মোট ৪টি উপজেলায়		১,২৩২	৩১,৭৯৭	৩৭৩	৯,২৮০	১,৬০৫	৪০,০৭৭

সশস্ত্র বাহিনীর গ্যারিসন স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসী নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। নিম্নে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলার তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো—

ক্রঃ	বিবরণ	জমি (একর)
১.	সুয়ালকে গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত	১১,৪৪৫.৪৫
২.	সুয়ালক গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রক্রিয়াধীন	১৯,০০০.০০
৩.	রুমায় প্যারা কমান্ডো ও এ্যাভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টার প্রক্রিয়াধীন	৯,৫৬০.০০
৪.	বান্দরবানে ব্রিগেড সদর দপ্তর সম্প্রসারণ চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন	১৮১.০০
৫.	চিম্বুক পাহাড়ে ইকোপার্ক ও সেনাবাহিনীর পর্যটন কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন	৫,৫০০.০০
৬.	বান্দরবান-লামা বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন	২৬,০০০.০০
	মোট জমির পরিমাণ	৭৫,৬৮৬.৪৫

সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশপরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে পরবাসী হয়ে পড়েছে—

ক্রঃ	উপজেলা	মৌজার সংখ্যা	জমি (একর)
১.	আলিকদম উপজেলা	৩টি	৫,৭৫৪.৯৮
২.	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৩টি	৪,৮৪০.০০
৩.	লামা উপজেলায়	৫টি	২,৭৮০.৯৯
৪.	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫টি	১৫,৭৫০.০০
৫.	রোয়াংছড়ি উপজেলা	১০টি	৪৫,৯৫০.০০
৬.	রুমা উপজেলা	৫টি	১১,৫০০.০০
৭.	থানছি উপজেলা	৪টি	৭,৫০০.০০
মোট ৭টি উপজেলায় ৩৫টি মৌজায় জমির পরিমাণ			৯৪,০৬৬.৯৭
প্রজ্ঞাপন বহির্ভূত কিন্তু বন বিভাগের দখলে রয়েছে জমির পরিমাণ			২৩,৯৩৩.০৩
মোট বন বিভাগের আওতায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য দখলকৃত জমি			১,১৮,০০০.০০

পরিষদের বিশেষ অধিকার

এই খণ্ডের ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে। অধিকন্তু ২৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার থাকবে। ৩২নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা থেকে সরকার বিরত রয়েছে।

পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে অধিকতর শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে আরো নতুন ১২টি বিষয়সহ নিম্নোক্ত মোট ৩৩টি বিষয় (যাতে ৬৮টি কর্ম রয়েছে) পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের বিধান রয়েছে-

[১। জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;

১ক। পুলিশ (স্থানীয়);

১খ। উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;][১]

২। জেলায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা-

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা;

(ঘ) ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান;

(ছ) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা;

(জ) শিশু ছাত্রদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা;

(ঝ) গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ;

(ঞ) পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ[;][২]

[(ট) বৃত্তিমূলক শিক্ষা;

(ঠ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;

(ড) মাধ্যমিক শিক্ষা।][৩]

৪। স্বাস্থ্য-

(ক) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেনসারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;

(গ) ধাত্রী প্রশিক্ষণ;

(ঘ) ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

---

[১] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা '১। জেলার অইন শৃংখলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান।' শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয়.।

[২] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হয়।

[৩] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা এসব কার্যাবলী সংযোজিত হয়।

(চ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন;

(ছ) কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর কার্য পরিদর্শন;

(জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রস্তাব।

৬। কৃষি ও বন-

(ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সরকার কর্তৃক [*][৪] রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

(গ) উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান;

(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ;

(চ) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কোন ব্যাঘাত না ঘটাইয়া বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষিকার্য্যে ব্যবহার্য্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;

(জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;

(ঝ) শস্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্যে বীজের ঋণদান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;

(ঞ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে বৃক্ষ রোপন ও উহার সংরক্ষণ।

৭। পশু পালন—

(ক) পশু-পাখি উন্নয়ন;

(খ) পশু-পাখির হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) পশু খাদ্যের মজুত গড়িয়া তোলা;

(ঘ) গৃহপালিত পশুসম্পদ সংরক্ষণ;

(ঙ) চারণভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন;

(চ) পশু-পাখির ব্যাধি প্রতিরোধ ও দূরীকরণ এবং পশু-পাখির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) দুগ্ধপল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ;

(জ) গৃহপালিত পশু খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঝ) হাঁসমুরগী খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঞ) গৃহপালিত পশু ও হাঁসমুরগী পালন-উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) দুগ্ধ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৮। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

---

[৪] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা 'সংরক্ষিত বা' শব্দটি বিলুপ্ত করা হয়।

১০। শিল্প ও বাণিজ্য—

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) স্থানীয়ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) হাট বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা;

(ঙ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) গ্রাম বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১১। সমাজকল্যাণ—

(ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, অনাথ আশ্রয়, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফন বা অন্তোষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ;

(ঘ) জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর উন্নয়ন;

(ঙ) দরিদ্রদের জন্য আইনের সাহায্য (লিগ্যাল এইড) সংগঠন;

(চ) সালিশী ও আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) দুঃস্থ ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;

(জ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২। সংস্কৃতি—

(ক) সাধারণ ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধূলার উন্নয়ন;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে রেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন ও প্রদর্শনীর সংগঠন;

(ঙ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা;

(চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা, গবাদিপশু প্রজনন সম্পর্কীত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কীত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার;

(ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদ্‌যাপন;

(জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা;

(ঝ) শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধূলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) স্থানীয় এলাকায় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ;

(ট) তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঠ) সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

১৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

১৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

[২২। পুলিশ (স্থানীয়);

২৩। উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

২৪। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

২৫। কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

২৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

২৭। যুব কল্যাণ;

২৮। স্থানীয় পর্যটন;

২৯। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

৩০। স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

৩১। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

৩২। মহাজনী কারবার;

৩৩। জুম চাষ।][৫]

---

[৫] ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা সংযোজিত হয়।

উপরোক্ত অধিকাংশ বিষয় এখনো পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে কতিপয় প্রতিষ্ঠান ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদে নিকট হস্তান্তর হয়নি। ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে এযাবৎ নিম্নোক্ত ১২টি বিষয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ হস্তান্তর করা হয়—

১। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ

২। স্বাস্থ্য-

(ক) স্বাস্থ্য বিভাগ

(খ) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ

৩। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ

৪। শিল্প ও বাণিজ্য-

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন

(খ) বাজারফান্ড প্রশাসন

(গ) টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট

৫। সমবায় বিভাগ

৬। সমাজসেবা বিভাগ

৭। মৎস্য বিভাগ

৮। পশু সম্পদ বিভাগ

৯। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১০। সংস্কৃতি-

(ক) উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (খাগড়াছড়ি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ব্যতীত)

(খ) শিল্পকলা একাডেমী

(গ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা

(ঘ) পাবলিক লাইব্রেরী

১১। যুব ও ক্রীড়া দপ্তর

১২। অন্যান্য-

(ক) জেলা রেডক্রিসেন্ট ইউনিট

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিভাগসমূহের কেবলমাত্র জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্ম ও বেতন-ভাতাদি জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে বাজারফান্ড প্রশাসন ও বিসিক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কেবল কর্ম ও বেতন-ভাতাদি হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্তুতঃ এখনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও উৎসাদির উপর কর, রেইট, টোল এবং ফিস আরোপের ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ইহা কার্যকর করার ক্ষমতা পরিষদসমূহকে দেওয়া হয়নি। দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদ বলবৎ থাকার কারণে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারেনি। ফলতঃ জেলা পরিষদসমূহ জেলার সার্বিক উন্নয়নে তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এই খণ্ডের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এই ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ-

১। ১৯৯৮ সালের ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে।

২। ১৯৯৯ সালের ১২ মে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ২৭ মে অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের যাত্রা শুরু হয়।

৩। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হলেও সরকার এখনো পরিষদের কার্যবিধিমালা ঝুলিয়ে রেখেছে। এ পরিষদকে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয়নি। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা উল্লেখ করা গেল—

পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

এই খণ্ডের ৯নং ধারার (ক) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় এবং অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে কার্যকরকরণের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। সরকারের অসদিচ্ছার কারণে ও ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণ নীতির ফলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আঞ্চলিক পরিষদকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রয়েছেন।

বিগত ২০০৫ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম, বহিরাগত লোকদেরকে নিয়োগ, সংরক্ষিত কোটা অনুসরণ না করা ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তির মুখে জনস্বার্থে আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে তদন্ত করার উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে বান্দরবান জেলা পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদকে এ বিষয়ে সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে বিরত থাকেন। অপরদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন বিষয়ের উপর তদন্ত বা তত্ত্বাবধান করার কোন এখতিয়ার আঞ্চলিক পরিষদের নেই বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকেও এ সময় একটি আইন পরিপন্থী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলতঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

এই খণ্ডের ৯নং ধারার (খ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং পৌরসভার অধিকাংশ চেয়ারম্যানগণের সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক ভূমিকার কারণে এক্ষেত্রে পরিষদের আইন কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই পৌরসভাসমূহও আঞ্চলিক পরিষদকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগে অসহযোগিতা ও বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালে রাঙ্গামাটি পৌরসভায় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠে। আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হলে রাঙ্গামাটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে। বিষয়টি সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান

এই খণ্ডের ৯নং ধারার (গ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত) শেখ হাসিনা সরকারের আমলে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে গত ১০ এপ্রিল ২০০১ তারিখে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে মর্মে পরিপত্র জারী করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। বিশেষ করে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মহল হতে চুক্তি বিরোধীতাকরণে মদদ থাকায় এবং কর্মকর্তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে উপরোক্ত আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে চলেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন

এই খণ্ডের ৯নং ধারার (ঘ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওসমূহের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করার ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় দেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটি ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এসব ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমে চরম অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে।

পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় এনজিওদের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংশোধন না করে এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতল জেলাসমূহের মত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সমন্বয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি প্রকল্প অনুমোদনপত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিবর্তে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ জারী করা হয়। এর ফলে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদ সম্পৃক্ত থাকলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অন্ধকারে থেকে যায়।

উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার

এই খণ্ডের ৯নং ধারার (ঙ) উপ-ধারা মোতাবেক উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ জুম্মদের সামাজিক বিচারের উপর নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান

এই খণ্ডের ৯নং ধারার (চ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হচ্ছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান

এই খণ্ডের ১০নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা এবং উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের মধ্যে প্রথম অংশ আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও শেষাংশ আইনে সন্নিবেশ করা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) একজন জুম্ম এমপি'কে বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিলেও বিগত বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উল্লেখিত বিধানকে লঙ্ঘন করে ২০০১ সালে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত বিএনপি'র সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে (যিনি একজন সেটেলার) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম চালিয়ে যান। সর্বোপরি ক্ষমতার অপব্যবহার, দলীয়করণ, চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল তছনছ করেন। তারই নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। তার এই উগ্র সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, দলীয়করণ, চরম দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হয় আর অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায়।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে গত ২০০৭ সালের অক্টোবরে ২৪ পতাদিক ডিভিশনের জিওসি'কে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়েছে। পূর্বের মতো বর্তমানেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম চলছে।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ

এই খণ্ডের ১১নং ধারায় বর্ণিত আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের অসংগতি দূরীকরণ বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ নেয়নি।

অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ

এই খণ্ডের ১২নং ধারা মোতাবেক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ সনের মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিধি প্রবিধান প্রণীত না হওয়ার কারণে পরিষদ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন

এই খণ্ডের ১৩ নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ করে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার বিধান পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ী জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট সুপারিশ করা হলেও সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

এরমধ্যে এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীবিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিশন আইন ২০০১ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হলেও সরকার আজ অবধি কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ এই খণ্ডে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই খণ্ডে বর্ণিত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা একনজরে নিম্নরূপ—

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি বাস্তবায়ন হলেও অধিকাংশ জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি।

২। আওয়ামী লীগ সরকার টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে। কিন্তু আজ অবধি তাদেরকে পুনর্বাসন হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে চরম জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

৩। ভূমিহীন জুম্মদেরকে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়নি।

৪। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বিগত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে পর পর তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন ভূমি নিষ্পত্তির জন্য কোন কাজ শুরু করেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" প্রণীত হয়। কিন্তু উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা আজও সংশোধিত হয়নি।

৫। রাবার চাষ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অ-স্থানীয়দের নিকট বরাদ্দকৃত ভূমি ইজারা বাতিল করা হয়নি। পক্ষান্তরে চুক্তির পর অনেক ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

৬। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। বিগত জোট সরকার ও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

৭। পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যথাযথ বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।

৮। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পৃষ্টপোষকতার ক্ষেত্রে তেমন কোন পদক্ষেপ নেই।

৯। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের যথাযথভাবে অস্ত্র জমাদান সম্পন্ন হয়েছে। তবে সরকারের একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল জনসংহতি সমিতি সকল অস্ত্র জমা দেয়নি বলে অদ্যাবধি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

১০। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ও তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে; কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত আজ অবধি কার্যকর করা হয়নি। এছাড়া সাজাপ্রাপ্ত মামলা ও সামরিক আদালতের মামলাগুলিও অপ্রত্যাহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে।

১১। সরকার কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে জনপ্রতি এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ৬৪ জন সদস্যকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেছে। ৬৭৫ জনকে পুলিশবাহিনীতে ভর্তি করেছে। কিন্তু অপরাপর সদস্যদেরকে এখনো পর্যন্ত তাদের ঋণ মওকুফ ও দাখিলকৃত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেনি।

১২। পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়েছে। কিন্তু সরকার পক্ষ দাবী করছে এযাবৎ ১৭২টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহৃত হয়েছে তার কোন দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। অপরদিকে ২০০১ সালে 'অপারেশ দাবানল'-এর পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন বলবৎ এবং সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

১৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো বহিরাগতরা কর্মরত রয়েছে।

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে এবং Rules of Business, 1996-এর Schedule-1 (Allocation of Businesss among the different Ministries and Divisions)-এর অধীনে ১৫ জুলাই ১৯৯৮ মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন তালিকার প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বরাবরই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিম্নে চুক্তির এই খণ্ডে বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের সবিস্তৃত বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলো—

উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন

এই খণ্ডের ১নং ধারা অনুযায়ী এবং সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তন করে। টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি ও গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

মোট প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী সংখ্যা (৬৪,৬০৯ জন)	১২,২২২ পরিবার
ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি	৯,৭৮০পরিবার
প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে হালের গরুর টাকা পায়নি	৮৯০পরিবার
স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি	৬টি বিদ্যালয়
স্থানান্তারিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে	৫টি বাজার
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির	৭টি মন্দির
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম	৪০টি
ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা	৬৪২ জন

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে দীঘিনালার ট্রান্সজিট ক্যাম্পে (আবাসিক বিদ্যালয়) অবস্থানরত ২৬ পরিবার জুম্ম শরণার্থী, যাদের জমির উপর বোয়ালখালী বাজার স্থাপনের ফলে এখনো নিজেদের বসতভিটায় বসতি করতে পারেনি, তাদেরকে ট্রান্সজিট ক্যাম্প থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে অন্যত্র পুনর্বাসন দেয়া হয়। তারা এতদিন নিজেদের জমি ও বসতভিটা ফেরত পাওয়ার দাবী করে আসছিল।

বিগত জোট সরকার ২০০৩ সালে জুম্ম শরণার্থীদের রেশন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে জুম্ম শরণার্থীদের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে ১৩ অক্টোবর ২০০৩ সরকার শরণার্থীদের রেশন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মাঝখানে এক বছর ধরে মাত্র অর্ধেক রেশন দেয়। এক বছরের উক্ত বকেয়া অর্ধেক রেশন আজও শরণার্থীরা পায়নি।

আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

এই খণ্ডের ১ ও ২নং ধারা মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকলেও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। চুক্তিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বুঝানো হয়ে

থাকলেও সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিদানকারী সেটেলার বাঙালীদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী এই উদ্যোগের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় নবম সভা চলাকালে ওয়াকআউট করেন। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে পার্বত্যবাসীর প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

১৫ মে ২০০০ তারিখের একাদশ সভায় টাস্কফোর্স একতরফাভাবে পরিচিহ্নিত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংখ্যা ও ঘোষিত প্যাকেজ সুবিধাদি নিম্নরূপ ঃ

জেলা	উপজাতীয় পরিবার	অউপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
রাঙ্গামাটি	৩৫,৫৯৫	১৫,৫৯৫	৫১,১১১
বান্দরবান	৮,০৪৩	২৬৯	৮,৩১২
খাগড়াছড়ি	৪৬,৫৭০	২২,৩৭১	৬৮,৯৪১
সর্বমোট	৯০,২০৮	৩৮,১৫৬	১,২৮,৩১৪

প্যাকেজ সুবিধা ঃ

১) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

২) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হতে অস্ত্রবিরতির পূর্বদিন পর্যন্ত (১০-৮-৯২) যে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের—

(ক) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ রয়েছে তা সুদসহ মওকুফ করা যেতে পারে।

(খ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার উপরের ঋণসমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা যেতে পারে।

৩) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৪) আয়বর্ধন কর্মসূচীর জন্য একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত বরাদ্দ হতে তফসীল ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এর আগে ২০০০ সালের জুন মাসে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়কের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলার সমস্যা নিরসন বিষয়ে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়—

১. (ক) বহিরাগত অ-উপজাতীয় সেটেলারদেরকে আভ্যন্তরীণ অ-উপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা। এতদুদ্দেশ্যে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ হতে টাস্ক ফোর্সের নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ তারিখের আদেশপত্রের অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করা।

(খ) বহিরাগত অ-উপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা এবং উক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা।

২. (ক) আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

(খ) বিভিন্ন থানায় বাদ পড়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩. টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধার পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা অত্যন্ত কম। উক্ত ধরনের সুবিধা দিয়ে কোন অবস্থাতেই উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের প্রকৃত পুনর্বাসন সম্ভব হতে পারে না। উক্ত প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভায় পেশকৃত প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাদি হতে অনেক কম। পেশকৃত উক্ত সুযোগ-সুবিধাদি হলো-

(ক) বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান করা;

(খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ, ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ নগদ ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা;

(গ) এককালীন অর্থ সাহায্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করা;

(ঘ) এক বৎসরের রেশনসহ তেল, ডাল ও লবণ প্রদান করা;

(ঙ) ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান করা;

(চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা;

(জ) চাকুরীতে পুনর্বহাল করা ও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা;

(ঝ) হেডম্যানদের পুনর্বহাল করা;

(ঞ) ঋণ মওকুফ করা;

(ট) মামলা প্রত্যাহার করা।

বিগত জোট সরকারের আমলে জনসংহতি সমিতির দাবীর মুখে গত ২৯ অক্টোবর ২০০৪ সমীরণ দেওয়ানকে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হওয়ার পর এ যাবৎ ২০০৪ সালের ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৫ জুলাই এবং ২১ শে নভেম্বর এই চার বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে মৌলিক কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পূর্ববর্তী টাস্ক ফোর্সের সূত্র ধরে পূর্বের মতোই সরকার পক্ষ সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার পক্ষের এই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান টাস্ক ফোর্সও পূর্বের মতো অচল হয়ে পড়েছে। ফলতঃ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গত ৩ জুন ২০০৭ খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কার্যতঃ টাস্ক ফোর্সের তৎকালীন সদস্য-সচিব চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের একতরফা বাগম্বর সংলাপ ছাড়া কোন কিছুই কার্যকর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সভার পর পরই টাস্ক ফোর্সের সদস্য ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধি সন্তোষিত চাকমা বকুলকে সার্কিট হাউসের সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মূলতঃ জরুরী অবস্থার সুযোগে সন্তোষিত চাকমা বকুলকে গ্রেপ্তার করে জুম্ম শরণার্থীদের ভূমি ফেরৎ পাওয়ার দাবীকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে এ সভা ডাকা হয় বলে প্রতীয়মান হয়।

ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত

এই খণ্ডের ৩নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক ভূমিহীন বা দু' একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু' একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান থাকলেও সরকার পক্ষ হতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

এই খণ্ডের ৪নং ধারায় বলা আছে যে, জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

এই ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করেনি। উল্লেখ্য যে, এই ধারা অনুযায়ী ৩ জুন ১৯৯৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ৫ এপ্রিল ২০০০ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফর করেন। তারপর তিনিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর প্রায় দেড় বছর ধরে চেয়ারম্যান পদ শূন্য থাকে, পরে বিগত জোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ২৯ নভেম্বর ২০০১ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। তিনিও গত নভেম্বর ২০০৭ সালে মারা যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে দাবী করা হলেও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান এখনো নিয়োগ প্রদান করেনি।

উল্লেখ্য যে, বিচারপতি মাহমুদুর রহমানের আমলে গত ৮ জুন ২০০৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় সাড়ে সাত বছর পরে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে ভূমি কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়। কিন্তু ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলতঃ বর্তমানে ভূমি কমিশনের কাজ বিগত এগার বছর ধরে অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে।

অপরদিকে ভূমি কমিশনের সচিব হিসেবে একজন অ-স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত রয়ে যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক একদিন আগে ১২ জুলাই ২০০১ তড়িঘড়ি করে জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' পাশ করে। এই আইন পাশ করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত পরামর্শ ও সুপারিশমালা গ্রহণ না করেই। ফলে এই আইনে রয়ে যায় চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক বিষয়-যা চুক্তি ও জুম্ম জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। বিরোধাত্মক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—

১) আইনের ২(চ) ধারাতে 'পুনর্বাসিত শরণার্থী' অর্থ বলা হয়েছে যে, '৯ই মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভুক্ত শরণার্থী'। এই বিধান দ্বারা কেবলমাত্র ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ফিরে আসা শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে। ১৯৯২ সালে সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত ১৬ দফা চুক্তির আওতায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে না। ফলে তাদের ভূমি বিরোধ অনিষ্পন্নই থেকে যাবে।

২) চুক্তিতে প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হয়। কিন্তু ভূমি কমিশন আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১)(ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র 'পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধ' নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিষ্পন্নই থেকে যাবে।

৩) চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬(১)(খ) ধারায় কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) চুক্তিতে 'ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)' বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও ভূমি কমিশন আইনে জলেভাসা জমির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৫) কমিশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আইনের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে'। এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের রাবার ষ্টাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

৬) কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের ১৩(১)(২) ধারাতে চুক্তির 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে' এই ধারা সংযোজন করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর যে সকল ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক, সেসকল ধারা সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে ১৯ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিগত জোট সরকারের আমলে ১২ মার্চ ২০০২ আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রী মওদুদ আহমদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন পরিষদের প্রতিনিধিদলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় ১৮টি সুপারিশ বিষয়ে ঐকমত্য হয়। কিন্তু অন্য একটি সুপারিশ অর্থাৎ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ''কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমি (ফ্রিঞ্জল্যান্ড)'' এর ক্ষেত্রেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা সংক্রান্ত সুপারিশ বিষয়ে ঐক্যমত হয়নি। তবে পরবর্তীতে ২১ জানুয়ারী ২০০৩ সালে তৎকালীন আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ-এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের অনুষ্ঠিত বৈঠকে উক্ত বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

তদনুসারে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু উক্ত আইন সরকার এখনো তদনুযায়ী সংশোধন করেনি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উক্ত আইন সংশোধন করা হবে বলে বিভিন্ন সেমিনার-আলোচনা সভায় অনেক উপদেষ্টা প্রতিশ্রুতি দিতেও তার কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ আইন ও ভূমি উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার হাসান আরিফ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ সহকারী ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষ রায়ের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন পরিষদের প্রতিনিধিদলের মধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভায় উক্ত আইন সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হবে বলে উক্ত সভায় উপদেষ্টা মহোদয় আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু কার্যতঃ আজ অবধি কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিষয়টি এখনো চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরাজ করছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভূমি বিরোধ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হচ্ছে এবং সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ

এই খণ্ডের ৮নং ধারা মোতাবেক যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। আশি ও নব্বই দশকে মোট ১,৬০৫টি প্লট যার মোট ভূমির পরিমাণ ৪০,০৭৭ একর রাবার বা উদ্যান চাষের জন্য অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব বরাদ্দকৃত একটি প্লটও আজ অবধি বাতিল করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ বান্দরবান জেলায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ম লজ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বিএনপি'র নেতা জনাব অলি আহমেদের নিকট এরূপ জমি বরাদ্দের ফলে বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের মুরুং জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ২৫০ পরিবার নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশ পরম্পরায় জুম চাষ ও বসতি করে আসা জমিতে এখন তারা পরবাসী হয়ে পড়ছে।

২০০০ সালের জুন মাসে তৎকালীন বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লজ্ঘন করে জেলার সুয়ালক মৌজা (হোল্ডিং ৭০৪ ও ৭০৬) ও তুমব্রু মৌজায় (হোল্ডিং ৬৩ ও ৬৭) ২৫ থেকে ৫০ একর পরিমাণ বেশ কয়েকটি প্লট তার আত্মীয়-স্বজন এবং জেলা পুলিশ সুপার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ ও রাজস্ব) ও বান্দরবান সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরিবারের সদস্যদের নামে ইজারা প্রদান করে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এই অবৈধ ইজারা প্রদানের কাজে জড়িত ছিল বলে জানা গেছে।

বহিরাগত বাঙালীদের গঠিত ও পরিচালিত ডেভেলাপমেন্ট অর্গনাইশেন অব দ্যা রুরাল পুওর (ডর্প) নামে একটি এনজিও'কে বান্দরবান জেলার সরই ইউনিয়নের টঙ্গোঝিরি এলাকায় আদিবাসী ত্রিপুরা গ্রামবাসীর ২৫ একর জমি তাদের অগোচরে ইজারা দেয়া হয়। এসব জমিতে ত্রিপুরা অধিবাসীদের বাগান-বাগিচাও গড়ে তুলেছে। গত মে মাসে (২০০৮ সাল) ডর্পের লোকজন ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের গড়ে তোলা এসব বাগান-বাগিচা কেটে আগুন লাগিয়ে পরিষ্কার করে এবং সেখানে 'ডর্প স্বাস্থ্য পল্লী' নামে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেও আজ অবধি এর কোন সুরাহা হয়নি। ত্রিপুরা গ্রামবাসীরা এখন উচ্ছেদের আতঙ্কে রয়েছে।

অনুরূপভাবে ডেসটিনি-২০০০ নামে বহুমুখী বাজারজাত কোম্পানী আদিবাসী জায়গা-জমি দখল করে এবং ইজারা দেয়া জায়গা-জমি ক্রয় করে বান্দরবান সদর উপজেলার চেমি ডুলু পাড়া এলাকায় বনায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ডেসটিনি-২০০০ এর লোকজন কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে জায়গা-জমি পরিষ্কার করতে আসে। পরে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে তারা পিছু হটে। তবে গ্রামবাসীরা এখনো উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

এ বছর অতি সম্প্রতি প্রায় ১০০ একর জুমভূমি দখল করে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বাদলছড়া মৌজার আলুটিলা মৌনে অতি সম্প্রতি থেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ নামে একটি এনজিও বনায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে এলাকার আদিবাসী ত্রিপুরা সম্প্রদায় উচ্ছেদ আতঙ্কে মধ্যে রয়েছে। এসব ভূমিতে তাদের জুম চাষ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ

এই খণ্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো

তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা ও এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা এবং এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগানোর বিধান থাকলেও সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থায়ন করেনি। বিগত জোট সরকার ও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বাজেট অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করেনি। অপরপক্ষে বিগত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সিংহভাগ অর্থ কর্তন করা হয়।

বিগত জোট সরকার ও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সেনাবাহিনীকে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। এই অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটেলার বাঙালীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জুম্মদের ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে সেটেলার বাঙালীদের সংগঠিতকরণসহ চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্তকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর বরাবরে বরাদ্দকৃত শান্তকরণ প্রকল্পের ১০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের মাধ্যমে চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পর্যটন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কার্যকর কোন আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি। এমনকি "স্থানীয় পর্যটন" বিষয়টি এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি এবং এই খাতে বিগত জোট সরকার ও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করছে না।

কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান

এই খণ্ডের ১০নং ধারা মোতাবেক চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করার বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) পাহাড়ীদের কোটা সংরক্ষিত থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকারী কোন বৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উপজাতীয় কোটা'কে 'পার্বত্য কোটা' হিসেবে রূপান্তরিত করে সেটেলার বাঙালীদেরও উক্ত কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সরকারী চাকুরীতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষিত আছে। কিন্তু তা যথাযথভাবে কার্যকর হয় না। ১৯৭২ সাল থেকে এ যাবৎ বিসিএস-এর ২২টি ব্যাচে মোট ২৯,৬৬৭ জন ক্যাডার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৫% হারে হিসেব করলে মোট ১,৪৮৩ জন আদিবাসী ব্যক্তি নিয়োগ পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা অনেক অনেক নীচে।

উল্লেখ্য যে, বিগত সেপ্টেম্বর ২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক একটি কমিটি জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের কোটা বৃদ্ধি ও যথাযথ সংরক্ষণের জন্য শিক্ষামন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করেন। নিম্নে উক্ত শিক্ষা বিষয়ক কমিটির কোটা সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরা হলো—

(ক) নিম্নোক্ত প্রস্তাবানুসারে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা বৃদ্ধি করা—

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কোটার বর্তমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত কোটার আসন সংখ্যা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫টি	প্রতিটি বিভাগে ৩ টি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	প্রতিটি বিভাগে ২	প্রতিটি বিভাগে ৪ টি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১২ টি	প্রতিটি বিভাগে ৩ টি
অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়	--	প্রতিটি বিভাগে ২ টি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	৪টি (বিভিন্ন বিভাগে ৩ টি ও স্থাপত্য বিভাগে ১ টি	১০ টি (বিভিন্ন বিভাগে ৮ টি ও স্থাপত্য বিভাগে ২ টি
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩টি	প্রতিটি বিভাগে ৩ টি
মেডিকেল কলেজসমূহ	৯টি (প্রতিটি জেলায় ৩ টি করে)	১৮ টি (প্রতিটি জেলায় ৬ টি করে)
বিআইটি সমূহ	২০ টি	৩০ টি (জেলা প্রতি ১০ টি করে)
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	--	প্রতিটি বিভাগে ১ টি
কৃষি কলেজসমূহ	--	৬%
ইনষ্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	১ টি	৫টি
টিইনষ্টিটিউট অফ লেদার টেকনোলজি	৫%	৬%
পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটসমূহ	--	৬%
ক্যাডেট কলেজসমূহ	--	৬%
মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম	১ টি	৬%

খ) উপজাতীয় কোটার মধ্যে অধিকতর পশ্চাদপদ জাতিসত্তাসমূহের অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম নম্বরের অধিকারী হলে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তির সুযোগ প্রদান করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে উপজাতীয় কোটার নীতিমালা প্রণয়ন করা।

ঘ) মেডিক্যালসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় কোটার ভর্তির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান ও পুলিশ ভেরিফিকেশনের নিয়ম বাতিল করা।

ঙ) বিআইটিসমূহে ভর্তি পরীক্ষার ন্যূনতম নম্বরের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা এবং উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের সকল বিভাগে ভর্তির সমান সুযোগ প্রদান করা।

চ) সাধারণ প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে কোটায় অন্তর্ভুক্ত না করে মেধা তালিকায় ভর্তি করা।

ছ) উপজাতীয় কোটায় অউপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি রোধকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র চালু করা।

জ) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য স্কলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঝ) মেডিক্যাল, প্রকৌশল ও কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় কোটায় ভর্তিসহ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী বাছাই এর দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের হাতে হস্তান্তর করা।

কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

এই খণ্ডের ১১নং ধারা মোতাবেক আদিবাসী জুম্মদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মন্ত্রী-ভিআইপিদের নাচ-গান পরিবেশন করা এবং কিছু সংকলন প্রকাশ করার মধ্যেই সীমিত রয়েছে। পক্ষান্তরে জুম্মদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পূর্বেকার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী নাম পরিবর্তন করে বাঙালী বা ইসলামীকরণ অব্যাহত রয়েছে। পাঠ্য-পুস্তকে ইসলামী ধারার শিক্ষা গ্রহণে জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ্য-পুস্তকে যথাযথভাবে উল্লেখ নেই; যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অত্যন্ত বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জুম্মদেরকে ইসলামী কায়দায় 'জনাব' লিখতে বা সম্বোধন করতে বাধ্য করা হয়।

সেনাবাহিনী তল্লাসী অভিযানের নামে জুম্মদের উপর ধর্মীয় পরিহানি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। বরকল উপজেলায় ফালিটাঙ্যা চুগ ভাবনা কেন্দ্র ও বাঘাইছড়ির বাগান বাড়ী (চার মাইল এলাকা) নির্মাণাধীন বৌদ্ধ মন্দিরের জায়গায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দীঘিনালার বোয়ালখালী অনাথ আশ্রম ও মহালছড়ির বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথ আশ্রমের জবরদখল করে সেটেলাররা বাড়ী নির্মাণ করেছে। এছাড়া কালাচান মহাজন পাড়া বৌদ্ধ বিহার, বেনুবন বৌদ্ধ বিহার, উদয়চান বৌদ্ধ বিহার, ঘনমুয়া কার্বারী পাড়া বৌদ্ধ বিহার, তংঘ মহাজন পাড়া বৌদ্ধ বিহার, কৃষ্ণ দয়াল পাড়া হরি মন্দির, নোয়া পাড়া রামবাবু ঢেবা হরি মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জায়গা জবরদখল করে সশস্ত্রবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন ও সেটেলার বাঙালী বসতি প্রদান করা হয়েছে।

বিগত ২ নভেম্বর ২০০৬ রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের অন্তর্গত মুরালী পাড়া ধর্মরক্ষিত বৌদ্ধ বিহারে আয়োজিত অন্যতম বৃহৎ বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে অতর্কিতে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে কাপ্তাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আসাদের নেতৃত্বে একদল পুলিশ। হামলায় তারা অনুষ্ঠানস্থলে অস্থায়ী দোকানগুলোর উপর লুটপাট, অংশগ্রহণকারী জুম্ম জনতার উপর বেপরোয়া মারধর ও নারীদের উপর অশালীন অত্যাচার চালিয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহতও হয়েছেন।

গত ২০০৭ সালে আগষ্ট-অক্টোবর মাসে সেটেলার বাঙালীরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় দীঘিনালার বাবুছড়ার সাধনাটিলা নামক এলাকায় প্রায় ৩০০ একর জায়গা দখল করার চেষ্টা করে। এ সময় ঐ এলাকায় অবস্থিত সাধনাটিলা বনবিহারের সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে জবরদখলের চেষ্টা চালায়। পরে জুম্মদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে সেটেলাররা সরে আসে।

জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান

এই খণ্ডের ১৩নং ধারা মোতাবেক সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পালনীয় সব কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার

এই খণ্ডের ১৪নং ধারায় নির্ধারিত তারিখে জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করার বিধান রয়েছে। ১৬নং ধারায় জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা ও জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করার বিধান রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৬ দফায় ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯টি মামলার তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে যাচাইবাছাই করে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও আজ অবধি প্রত্যাহারের গেজেট জারী হয়নি। এছাড়া এখনো ১১৪টি মামলা অপ্রত্যাহারের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। অধিকন্তু সামরিক আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। সাজাপ্রাপ্ত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করেছেন। কিন্তু উক্ত আবেদনগুলো বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটকে রয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের খতিয়ান নিম্নে দেয়া গেল—

জেলা	মোট মামলা	প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত	অপ্রত্যাহৃত মামলা
রাঙ্গামাটি	৩৫০	২৮৫	৬৫*
খাগড়াছড়ি	৪৫১	৪০৫	৪৬
বান্দরবান	৩৮	৩০	৮
মোট	৮৪৪	৭২০	১১৪

অপরদিকে অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে বিধান করা হলেও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। গত ২৫ মে ২০০৪ গুইমারা আর্টিলারী ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ধুকছড়ি ক্যাম্পের লেঃ কর্ণেল আবদুর রউফ ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাহ্‌তাবউদ্দিন এর নেতৃত্বে ১২ ইঞ্জিনিয়ার কোরের একদল সেনা কর্তৃক জনসংহতি সমিতির গুইমারা অফিস সংলগ্ন বাড়ী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পিসিপি ও যুব সমিতি ১৭ জন কর্মীকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করে মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর করা হয়। গত ২৭ মে ২০০৪ খাগড়াছড়ি থানার ওসি আবুল কালামের নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ যৌথভাবে জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিসে হানা দিয়ে জনসংহতি সমিতির ৩৩ জন নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার করে এবং মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে জেল হাজতে পাঠায়।

গত ৭ মে ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পানছড়ি উপজেলায় পানছড়ি সেনা জোনের জনৈক সেনা গোয়েন্দা মোঃ বেলাল কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই পানছড়ি উপজেলার নালকাটা গ্রামের বাসিন্দা জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য বুদ্ধরঞ্জন চাকমা ওরফে কুসুম (৪০) পীং গন্ধরাজ চাকমাকে পানছড়ি বাজার হতে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পরপরই পানছড়ি জোনের মেজর নাসিমের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য সেনাজোনে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধরঞ্জন চাকমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন চালায় এবং হাতে একটি বন্দুক গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে নেয়। পরের দিন মিথ্যাভাবে অস্ত্র মামলায় জড়িত করে সেনাসদস্যরা বুদ্ধরঞ্জন চাকমাকে পানছড়ি থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

গত ১৫ নভেম্বর ২০০৫ খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য সুশীল কুমার চাকমা সোহেলকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সন্ধ্যায় পানছড়ি সেনা জোনের অধিনায়ক মঈন চৌধুরী জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য কিরণ উদয় চাকমাকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে হুমকি দেয় যে, আন্দোলন করলে কি হয় তা কয়েকদিন পরে বুঝিয়ে দেবো।

দেশে জরুরী অবস্থা জারীর পর জরুরী অবস্থার সুযোগ অস্ত্র গুঁজে দিয়ে বা ষড়যন্ত্র করে জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ান, কেন্দ্রীয় সদস্য তাতিন্দ্র লাল চাকমা ও বিমল কান্তি চাকমাসহ প্রায় ১৫ জনের মতো জনসংহতি সমিতির সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে সত্যবীর দেওয়ান, সমিতির কাপ্তাই থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিক্রম মারমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইমং মারমাকে মিথ্যা মামলার অভিযোগে ১০ থেকে ১৯ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন

এই খণ্ডের ১৪নং ধারায় জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা, প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাদের পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা এবং এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করার বিধান রয়েছে।

পূর্বে চাকুরীতে ছিলেন ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিকট বার বার আবেদন সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে তারা চাকুরীতে পুনর্বহাল হলেও চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে সরকার জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফের আবেদন করা হলেও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার

এই খণ্ডের ১৭নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে 'আঞ্চলিক পরিষদ' যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবে।

এই চুক্তির স্বাক্ষরের পর বিগত ৮ বছরে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি জনসংহতি সমিতির নিকট হস্তগত হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকার প্রচার করছে যে, এযাবৎ ১৭২টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে তার তালিকা সম্বলিত কোন চিঠিপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। সরকারের চিঠি মোতাবেক ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিবরণ নিম্নরূপ–

পত্র	সূত্র	প্রত্যাহৃত ক্যাম্প সংখ্যা
পাচবিম(সম-১)১০৩/৯৮/৮৬ তারিখ ১৫/০৪/৯৯	সেনা সদর দপ্তর, ২০ আগষ্ট' ৯৮, ৩ সেপ্টেম্বর'৯৮	১০টি
	২ মার্চ'৯৯	১টি
	২২ মার্চ'৯৯৮	৮টি
	২৫ মার্চ'৯৯	২টি
পাচবিম(সম-১)১০৬/৯৮/১৩০ তারিখ ১০/০৬/৯৯	--	৩১০টি
	মোট	৩১টি

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংঘাতকালীন সময়ে জারীকৃত সেনাশাসন এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রয়েছে। 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে একপ্রকার সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এই ধারার (খ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু চুক্তির এই ধারা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গা মূল মালিক বা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। উপরন্তু ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করা হচ্ছে। যেমন-

১।	বিলাইছড়ি ক্যাম্প থেকে এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন (১৭ অক্টোবর ২০০৩); এ সময় উপজেলার সাক্রাছড়ি ক্যাম্প ও গাছকাবাছড়া ক্যাম্পেও এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন
২।	রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ
৩।	বান্দরবান সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের নামে ১৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ
৪।	বান্দরবানে আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে ৩০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৫।	বান্দরবানে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৬।	লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ
৭।	পানছড়ি জোন সম্প্রসারণের জন্য ১৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ
৮।	মাটিরাঙ্গা উপজেলায় গোকুলসমমণি কার্বারী পাড়ায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
৯।	কাউখালী উপজেলার ঘাগড়ায় ঘিলাছড়ি মুখ তালুকদার পাড়ার প্রীতি বিকাশ তালুকদার ও সাধন বিকাশ চাকমার ভূমি জবরদখল করে ক্যাম্প স্থাপন (১৬ জুন ২০০৩)
১০।	মানিকছড়ি উপজেলার ২নং বাটনাতলী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১১।	লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক স্থানে সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১২।	কাউখালী উপজেলাধীন খিয়াম এলাকায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
১৩।	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাসা ইউনিয়নের বেতছড়া নামক স্থানে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন (জানুয়ারী ২০০৫)
১৪।	রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া বাজারে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (২০০৫)
১৫।	খাগড়াছড়ি জেলার দাঁতকুপ্যা গ্রামে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (মার্চ ২০০৭)

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাহ্যতঃ সিভিল প্রশাসন বলবৎ থাকলেও অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে কার্যতঃ সেনাবাহিনীই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সিভিল প্রশাসনের উপর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণেই মহালছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় তৎকালীন খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বলেছিলেন, 'পাহাড়িরা অসহায়, আমি নিরুপায়' (৪ সেপ্টেম্বর'০৩ প্রথম আলো)। এই অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করায় তাকে সাথে সাথে অন্যত্র বদলি করা হয়। সম্প্রতি নাইক্ষ্যংছড়িতে অস্ত্র উদ্ধারের পর সেনাবাহিনীর একাধিপত্যের কিছু কথা পত্রিকায় সংবাদে চলে আসে। বান্দরবান জেলা পুলিশ সুপার বলেছিলেন, 'আমাকে এখানে কেউ কোন তথ্য দেয় না।

দেবার প্রয়োজনও মনে করে না' (৮ সেপ্টেম্বর'০৫, জনকণ্ঠ)। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য জেলা পরিষদকে সম্পৃক্তকরণের কথা বাদ, কেউ অবহিতকরণের তাগিদও অনুভব করে না।

এছাড়া সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে রাত্রিকালীন চলাচল নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ জারী করা হয় (৬ আগষ্ট'০৩)। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তথ্যাবলী সংগ্রহের নির্দেশ জারী করা হয় (দীঘিনালা সেনানিবাস, জুলাই'০৪)। স্কুল শিক্ষক, জুমচাষী, বোট চালক, হেডম্যান-কার্বারী, বাজার কমিটি ও ব্যবসায়ী, মৎস্য শিকারীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পার্বত্যাঞ্চলে সেটেলার বাঙালীদের কাছ থেকে জমির খাজনা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসককে গোপনীয় পত্র দেয়া হয়। এমনকি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এনজিওদের তথ্যাবলীও সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় (চট্টগ্রাম সেনানিবাস স্মারক নং-১০০৩/সিএ/২১/বিবিধ/৫৯, তারিখ ২২/৪/০২)। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাণিজ্যিক মোবাইল ফোন সেন্টার বন্ধ করা হয় (বিডিনিউজ ২০ আগষ্ট)। সেনা প্রশাসনের অমতে এখানে সিভিল প্রশাসন কিছুই করতে পারে না। এভাবেই আজ সিভিল প্রশাসনের কাঁধে ভর করে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে একপ্রকার সেনাশাসন।

এছাড়া সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বানচাল করা তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক উম্মাদনাকে উস্কে দিচ্ছে। এলক্ষ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'সমঅধিকার আন্দোলনে' যোগ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্মদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে 'আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ'এর উপর চাপ দেয়। এ উদ্দেশ্যে গত ১৪ জুন ২০০৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের ১৮ জন নেতৃবৃন্দকে রাঙ্গামাটি ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন ফেরদৌস কর্তৃক তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন ও হয়রানি করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে চেক পোষ্ট বসিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো যাত্রীবাহী বাস লঞ্চ থেকে শুরু করে সকল প্রকার যানবাহন তল্লাসীসহ গ্রামাঞ্চলে অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। যেমন ২০০৫ সালের মার্চে বিলাইছড়ি যাওয়ার পথে দীঘলছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ানের স্পিড বোট থামাতে বাধ্য করে। একইভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ানকে জুরাছড়ি যাওয়ার পথে ভিজেকিজিং নামক স্থানে এবং সাজেক যাওয়ার পথে চংড়াছড়ি-লেমুছড়ি নামক স্থানে থামানো হয়। এভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থা তো দূরেই, ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-চেয়ারম্যানও সেনা তল্লাসী থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই সেটেলার বাঙালী জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে এসব সাম্প্রদায়িক হামলার তথ্যাবলী দেয়া গেল-

সাম্প্রদায়িক হামলা	তারিখ	বাড়ীর সংখ্যা		নিহত	আহত	ধর্ষণ / যৌন হয়রানি
		ভস্মিভূত	লুটপাট/ তছনছ			
বাঘাইহাট হামলা	৪ এপ্রিল ১৯৯৯	--	--	--	৫১	১
বাবুছড়া হামলা	১৬ অক্টোবর ১৯৯৯	--	৭৪	৩	১৪০ (৩ জন ভিক্ষু)	১
বোয়ালখালী-মেরুং হামলা	১৮ মে ২০০১	৪২	১৯১	--	৫	--
রামগড় হামলা	২৫ জুন ২০০১১	১২৬	১১৮	--	অসংখ্য	--
রাজভিলা হামলা	১০অক্টোবর ২০০২	১১	১০০	--	৩	--
ভূয়াছড়া হামলা	১৯ এপ্রিল ২০০৩	৯	--	--	১২	--
মহালছড়ি হামলা	২৬ আগস্ট ২০০৩	৩৫৯	১৩৭	২	৫০	১০
মাইসছড়ি হামলা	৩ এপ্রিল ২০০৬	--	১০০	--	৫০	৪
সাজেক হামলা	২০ এপ্রিল ২০০৮	৭৮	৭৮	--	--	--

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গত ২০ এপ্রিল ২০০৮ জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সেটেলার বাঙালী পরিবারগুলোকে বসতিপ্রদানের লক্ষ্যে সাজেকের বাঘাইহাট-গঙ্গারাম এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয় যেখানে সাতটি জুম্ম গ্রামের শতাধিক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ২০০৭ সালের মার্চ মাসে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার দাঁতকুপ্যা মৌজায় দুই শতাধিক পরিবার বসতি প্রদান করা হয় ও তাদেরকে সহায়তার জন্য দাঁতকুপ্যা গ্রামে এসময় একটি নতুন ক্যাম্পও স্থাপন করা হয়। দেশে জরুরী অবস্থার মধ্যেও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি, করল্যাছড়ি, লেমুছড়ি ও ক্যাংঘাট এলাকায় কয়েক শত সেটেলার বাঙালী পরিবার বসতি প্রদান করা হয়েছে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দীঘিনালার বাবুছড়ায় ৮১২ পরিবার সেটেলার বাঙালী বসতি প্রদানের ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহতভাবে চলছে।

'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে আনসার, এপিবি ও ভিডিপিসহ সেনাবাহিনী সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে সামরিক অভিযান চালাতে পারে এবং পূর্বের মতো গ্রেপ্তার, মারধর, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও নিপীড়ন, ধর্মীয় পরিহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী অপতৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ

এই খণ্ডের ১৮নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রস্তাব করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় এখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং বাস্তবক্ষেত্রেও অদ্যাবধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এখানো পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরীতে বহিরাগতরা নিয়োগ লাভ করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই খণ্ডের ১৯নং ধারায় বর্ণিত উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে। Rules of Business, 1996-এর Schedule-I (Allocation of Businesss among the different Ministries and Divisions)-এর অধীনে ১৫ জুলাই ১৯৯৮ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতার তালিকার প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এই ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য জুম্মদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। এই ধারা লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়। পক্ষান্তরে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করে একজন উপমন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করা হয়। অপরদিকে এই ধারা মোতাবেক এখনো উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়নি। এই ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন না করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজ মনিটরিং করা হয়।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অ-আদিবাসী উপদেষ্টার হাতে অর্পণ করা হয়। পরে ২০০৭ সালের নভেম্বরে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টা একজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ করে তাঁর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

Rules of Business অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৯৯% জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী তথা এতদাঞ্চলের সামগ্রিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। ফলতঃ অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী অধিবাসী তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে লক্ষ্য করা যায়। বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিগত জোট সরকারের আমলে সাবেক এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে জোট সরকারের একটি প্রভাবশালী উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মহল জুম্ম জনগোষ্ঠী তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থ পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি ছায়া কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

ক) সাধারণ

১। উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	:	আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান	:	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	:	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান / ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সর্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন তরিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান

অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলির বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ" এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠ ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয়	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয়	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিয়ুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতরে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশার/অতিরিক্ত কমিশনার

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী;

২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ;

৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;

৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;

৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;

৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি;

৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি;

৮) সাংসদ, বান্দরবান;

৯) চাকমা রাজা;

১০) বোমাং রাজা;

১১) মং রাজা;

১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Parbatya Chattagramer Chukti Bastabayan Prasange 2 December 2008

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office.
Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Phone & Fax : +880-351-61248
E-mail: pejss@hotmail.com, pcjss.org@gmail.com, Website: www.pcjss.org

Price : Tk. 20.00 Only